বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। সুতরাং কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন তা মেনে নিলে, তাকে এদের সমসাময়িক বলতেই হবে।

কালিদাসের অপূর্ব কাব্য নিদর্শন রয়েছে তার রচিত চারটি কাব্য এবং তিনটি নাটকের মধ্যে।
কালিদাস রচিত তিনটি নাটক হল—
① মালবিকাগ্নিমিত্রম, ② বিক্রমোর্বশীয়ম,
③ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকের বিদিশার রাজশুঙ্গ বংশীয় অগ্নিমিত্রের ও বিদর্ভ রাজকন্যা মালবিকার প্রণয় কাহিনী স্থান পেয়েছে। নাটকটি পাঁচ অঙ্কে রচিত। রাজঅন্তঃপুরের পরিচারিকা অপূর্ব সুন্দরী নৃত্যপটীয়সী মালবিকাকে রানীর রাজ অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখার চেষ্টা করলেও বিদূষকের সাহায্যে রাজা তাকে দেখেন এবং মুগ্ধ হন। কালক্রমে মালবিকার সত্য পরিচয় প্রকাশিত হয় যে, সে বিদর্ভরাজকন্যা দস্যুহস্তে পড়ে এবং ঘটনাচক্রে বিদিশারাজের অন্তঃপুরে আশ্রয় পায়। অবশেষে নির্বিঘ্নে তাদের মিলন হয়।

কালিদাসের রচিত অপর একটি নাটক বিক্রমোর্বশী। রাজা পুরুরবার সঙ্গে অপ্সরা উর্বশীর প্রণয় কাহিনী পুরাণে মহাভারতে পাওয়া যায়। কালিদাস সেই কাহিনীকে প্রতিভার যাদুস্পর্শে মন্ডিত করে পুরো নাটকটি রচনা করেন। পুরুরবা অসুরগণের হাত থেকে উর্বশীকে উদ্ধার করেন। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশী স্বর্গে যান, সেখানে 'লক্ষ্মী স্বয়ংবর' নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করার সময় আনমনা উর্বশী পুরুষোত্তমের নাম করতে গিয়ে পুরুরবার নাম করে ফেলেন। নাট্যাচার্য ভরতের অভিশাপে

তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়, তিনি পুরুরবার পত্নী হলেন। তবে, ইন্দ্র শর্ত করেন যে, উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ রাজা দর্শন করলেই উর্বশী আবার স্বর্গে ফিরে আসবেন। পুত্র আয়ুর জন্মের পর উর্বশীর স্বর্গে ফিরে যাবার দিন এসে গেল। কিন্তু দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে পুরুরবা ইন্দ্রকে যে সাহায্য করেছিলেন, তার পুরস্কার স্বরূপ ইন্দ্র উর্বশীকে পুরুরবার পত্নীরূপে বাস করতে অনুমতি দেন। পুরুরবা-উর্বশীর প্রণয় কাহিনী নিয়ে রচিত এই নাটকটিতে কালিদাস যেভাবে চরিত্রদুটিকে পরিস্ফুট করেছেন, বিশেষত; উর্বশীর বিরহে পুরুরবার বিলাপ, কন্যের আশ্রমে উর্বশীর লতা রূপগ্রহণ ইত্যাদি যেভাবে কাব্যে রূপ পেয়েছে, তাতে কাব্যটি পৃথিবীর যেকোনো সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারে।

কালিদাসের নাট্য কৌশল ও কবি প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন তার সাত অঙ্কে রচিত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার যে উপাখ্যান মহাভারতে পাওয়া যায় তাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন কালিদাস তার এই নাটকে। তপোবন দুহিতা শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের প্রণয়, গান্ধর্ব পরিণয়, দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে পরিত্যাগ, শকুন্তলার পুত্রলাভ এবং অবশেষে স্বর্গে মরিচীর আশ্রমে উভয়ের সাক্ষাৎ ও মিলন ইত্যাদি ঘটনা স্থান পেয়েছে। নাটকটিতে কবি কেবল দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমকাহিনীই বর্ণনা করেননি, তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা না থাকলে যে দেহনিষ্ঠ কাম দেহাতীত প্রেমে পরিণত হতে পারেনা — তা-ই প্রতিপন্ন করেছেন।

অপূর্ব বস্তু নির্মানোক্ষম প্রতিভার অধিকারী কালিদাস নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে অসামান্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বিশ্ব সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। তিনটি নাটকের বিষয়বস্তু মূলত নরনারীর প্রেম। এই সামান্য বস্তুকেই নাট্যকার তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে অলোক-সামান্য করে তুলেছেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্,' নাটকে বিদর্ভ রাজকন্যা ও বিদিশা রাজের প্রণয় উপলক্ষ্য করে রাজা অন্তঃপুরে যে ষড়যন্ত্র চলছিল তার

স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করেছেন। মালবিকার প্রতি রাজার পরিচয় দিয়ে কালিদাস চিরন্তন মানবিক বৃত্তির, নব অনুরাগের ফলে কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতীর ঈর্ষা পরায়ণতা এবং মালবিকার প্রতি বিদ্বেষ সূচক মনোভাব, জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণীর মাতৃসুলভ বাৎসল্য, বিদূষকের বয়স্যপ্রীতি এবং রাজা অগ্নিমিত্রের প্রতি দায়িত্ববদ্ধতা সর্বোপরি অগ্নিমিত্র চরিত্রের নব অনুরাগের প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চিরকালীন মানুষের স্বভাবটি পরিস্ফুট হয়, আবার 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে পত্নী বিরহে পুরুরবার বিলাপ, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উর্বশীর লতারূপগ্রহণ, উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অতিমাত্রায় অধিকার প্রয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নাটকটিতে চরিত্রগুলি যেভাবে বিকশিত তাতেই নাটকটির অসাধারণত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়, কালিদাসের নাট্য প্রতিভার চরমতম নিদর্শন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'-এ, নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে সহমর্মীতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা কেবল অনবদ্যই নয় বিশ্ব সাহিত্যে বিরলও। আবার অন্যদিকে পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্তের কর্তৃক শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে যে নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে তা দর্শক/পাঠক চিত্তকে অবশ্যই অভিভূত করে। চতুর্থ অঙ্কে নাট্যকার শাশ্বত মানবচিত্তের কাছে একটি শাশ্বতী বৃত্তিকে অবলম্বন করে কালজয়ী আবেদন রেখেছেন। কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে নায়ক নায়িকার হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, লজ্জা, ভয়, বেদনা, বিস্ময় দুই ঋষিকুমার শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের উক্তি-প্রত্যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও নিজ নিজ অকপট হৃদয়ের সংযত অথচ সুদৃঢ় প্রকাশ চরিত্রগুলিতে যেমন গভীরতা এনেছে তেমনি নাটকটিতে মানব-মানবীর পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম জটিলতার উন্মোচনও করেছে। আসলে নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার শুধুমাত্র নরনারীর প্রেম কাহিনী বর্ণনা করেন নি, তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা না থাকলে যে দেহনিষ্ঠ কাম দেহাতীত প্রেমে পরিণত হতে পারে না তাই প্রতিপন্ন করেছে। সামগ্রিক বিচারে কালিদাস মূলত এই নাটকটির জন্যই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে পরিগণিত।

নাট্যকার কালিদাস :—

কবি অশ্বঘোষের পর সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মহাকবি কালিদাস। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য ধারায় মহাকাব্য রচয়িতা দুই ঋষিকবি (বাল্মীকি ও ব্যাসদেব)-র পরেই কালিদাসের নাম উচ্চারিত হয়। তাঁর কাব্যের রসমাধুর্য দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের 'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী' রসজ্ঞের হৃদয় জয় করেছে। জার্মানীর কবি গোটে, দার্শনিক হামবোর্ড, উইলিয়াম জোন্স, স্যার মোনিয়েল উইলিয়ামস্, মিঃ লেভি প্রমুখ বিশ্ব বন্দিত সাহিত্য তাত্ত্বিক ও সাহিত্য রস পিপাসু মনীষিবৃন্দ এই ভারতীয় কবি নাট্যকারের উদ্দেশ্যে স্তুতিবাদ করেছেন। আস কালিদাস ভারতের সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে আত্মগত করে আপন শিল্পবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত করে এক বিশ্বজনীন রূপ মহিমা মন্ডিত করে তুলেছেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই বিশ্ব হৃদয় জয়ী স্বর্ণ-জন্ম কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য জানা যায় না। যে সকল কিংবদন্তী তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে সেগুলিরও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, কবি তাঁর কোনো রচনাকর্মের মধ্যেই সময়কাল সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করেননি, তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকদের মধ্যে কালিদাসের সময়কাল নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে সবদিক বিবেচনা করে অধিকাংশ ঐতিহাসিক পন্ডিতে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ.বি.কীথ, ম্যাগডোনাল, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ অনুমান করেন যে ভারতবর্ষে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালের সুবর্ণ যুগেই মহাকবির আবির্ভাব ঘটেছিল। অর্থাৎ, কালিদাস চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০ - ৪১৪ খ্রীঃ) এবং তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫ - ৪৫৫ খ্রীঃ) — এই সময়েই কালিদাসের আবির্ভাব ঘটে বলেই পন্ডিতেরা অনুমান করেছেন। এই দুই রাজাই